জুম্ম সংবাদ বুলেটিন

পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম জন সংহতি সমিতির অনিয়মিত মুখপত্র

বুলেটিন নং ১৬, ৩য় বর্ষ, শনিবার, ১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৪

THE JUMMA SAMBAD BULLETIN

Newsletter of the Parbattya Chattagram Jana Samhati Samiti (JSS)

Issue No. 16, 3rd year, Saturday, 12th February, 1994

সম্পাদকীয়

সুদীর্ঘ সাড়ে সাত বছর পর এবারে জুম্ম শরণার্থীদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন শুরু হলো। বিষয়সম্পত্তি ও জীবনের নিরাপত্তার জন্য যে সমস্ত জুম্ম নরনারী শিশুবৃদ্ধ স্বদেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল তাদের প্রত্যাবর্তনে আজ দেশবাসী ও জুম্ম জনগণ আনন্দিত না হয়ে পারে না। তবে এ প্রত্যাবর্তন সবচেয়ে প্রত্যাশিত ছিল জুম্ম শরণার্থী-দের। এতে তাদের দুঃসহ বাস্তহীন অনিশ্চিত জীবনের অবসান হবে। জীবন ও বিষয়সম্পত্তির নিরাপত্তা নিয়ে নিজ বাস্তভিটায় ফিরে যেতে পারবে। তাদের এর চেয়ে আর কি আনন্দের হতে পারে?

কিন্তু জুম্ম শরণার্থীদের এবারের প্রত্যাবর্তন জুম্ম জনগণের জীবনে কতটুকু শান্তি বয়ে আনবে, বিরাজমান পার্বত্য সমস্যার কতটুকু সহায়ক হবে, এসব প্রশ্ন অনেকের। বস্তুতঃ অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে এসব প্রশ্নের স্ফুরণ ঘটে। যেহেতু ১৯৮৬ সালের সেই ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের অবতারণা ইতিমধ্যে ঘটেছে লোগাং ও বাদিয়ারচরে। ১৯৮৬ সাল থেকে সংঘটিত ৮টি গণহত্যার নরপিশাচরা এখনও মুক্তভাবে বিচরণ করছে। এমাবৎ কোন হত্যাকারীর বিচার হয়নি। কোন ধর্ষণকারীর কৃতকর্মের শাস্তি হয়নি। তাই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে প্রত্যাবর্তিত শরণার্থীরা কি তাদের বাস্তভিটায় দাঁড়াতে পারবে? হত্যা, ধর্ষণ ও লুণ্ঠনের বিচার পাবে কি? আর কে দেবে তাদের জীবনের নিরাপত্তা?

বাংলাদেশ সরকার কিন্তু এসব প্রশ্নে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ রাখেনি। সে প্রত্যাবর্তিত শরণার্থীদের জীবন ও সম্পত্তির পূর্ণ নিরাপত্তা, ভূমি ফেরত ও সুষ্ঠু পুনর্বাসনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, যেরূপ দিয়েছিল ১৯৭৮, ১৯৮১ ও ১৯৮৬ সালে। কিন্তু সেই অঙ্গীকার ও বাস্তবতার কোন মিল ছিল না। জুম্ম শরণার্থীরা সেবার নিজ বাস্তভিটায় ফিরে যেতে পারেনি। প্রতিশ্রুত কোন অর্থ ও পুনর্বাসন তারা পায়নি। তাই জুম্ম শরণার্থীদের সেই তিক্ত অভিজ্ঞতা আজও তাদের মনে ক্ষোভের সঞ্চার করে এবং এবারের সরকারের প্রতিশ্রুতিতে সন্দিহান হয়ে পড়ে।

বস্তুতঃ বাংলাদেশ সরকারের প্রতিশ্রুতি রক্ষার উপর নির্ভর করছে শরণার্থীদের পূর্ণপ্রত্যাবর্তন। প্রতিশ্রুত অর্থ, ভূমি ও জীবনের নিরাপত্তা পেলে সকল শরণার্থীরা অবশ্যই ফিরে আসবে। জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির নেতা উপেন্দ্র লাল চাকমার ভাষায় বলা যায়—বাংলাদেশ সরকার যদি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে ও শরণার্থীদের ঠিকমত পুনর্বাসন করে তাহলে শিবির থেকে অনেকে ফিরে আসবে। এক্ষেত্রে শরণার্থী বিদেশের মাটিতে উদ্বাস্তু জীবন কাটানোর কোন প্রশ্ন উঠে না। কে না চায় নিজ দেশে ফিরে আসতে?

জুম্ম শরণার্থীরা নিজ বাস্তভিটায় ফিরে আসুক এটা দেশবাসী ও জুম্ম জনগণের কাম্য। জনসংহতি সমিতিও জুম্ম শরণার্থীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে সর্বাত্মক সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে। জনসংহতি সমিতি মনে করে যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা থেকে এই শরণার্থী সমস্যাটি উদ্ভূত। তাই শরণার্থী সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য প্রয়োজন পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান। কাজেই বাংলাদেশ সরকারকে এই মহাসত্যকে মেনে নিতে আন্তরিক হতে হবে। জুম্ম জনগণ আশা করে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত বর্তমান বি এন পি সরকার জুম্ম শরণার্থী সমস্যার সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানে গণতান্ত্রিকভাবে এগিয়ে আসবে।

জুম্ম শরণার্থী প্রত্যাবর্তন

শ্রী জগদীশ

সুদীর্ঘ সাড়ে সাত বছর দুর্বহ উদ্বাস্তু জীবনের অবসান ঘটিয়ে জুম্ম শরণার্থীরা স্বদেশ প্রত্যাবর্তন শুরু করেছে। গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী থেকে এই প্রত্যাবর্তন শুরু হয়। এই প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকলে আগামী ১ বৎসরের মধ্যে সকল জুম্ম শরণার্থী স্বদেশে ফিরে আসতে সক্ষম হবে। জুম্ম শরণার্থীদের এই স্বদেশ প্রত্যাবর্তন সকল দেশবাসী ও জুম্ম জনগণের কাম্য। তাই এই প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়াকে সকল মহল অভিনন্দন জানিয়েছে।

কেন শরণার্থী সমস্যা

১৯৮৬ সালের মে-জুন মাস থেকে এই জুম্ম শরণার্থীরা ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের ৫টি শিবিরে প্রথম পর্যায়ে আশ্রয় নিতে শুরু করে। এ সময়ে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সহায়তায় অনুপ্রবেশকারীদের সাম্প্রদায়িক হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগের ফলে এসব জুম্মরা স্বদেশ ত্যাগ করে সীমান্ত পাড়ি দিতে বাধ্য হয়। শান্তিবাহিনী দমনের নামে বাংলাদেশ সেনারা খাগড়াছড়ি জেলায় রামগড়, মাটিরাঙ্গা, লক্ষ্মীছড়ি, পানছড়ি, খাগড়াছড়ি ও দিঘীনালা থানার বিরাট জুম্ম গ্রামবাসীদের বিরুদ্ধে এক সশস্ত্র অভিযান শুরু করলে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়। মূলতঃ জুম্মদেরকে নিজ বাস্তভিটা থেকে উচ্ছেদ করে তাদের ভূমি বেদখল করার লক্ষ্যে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়েছিল। এ সময়ে সংঘটিত হয় পর পর তিনটি হত্যাকাণ্ড— (১) পানছড়ি-খাগড়াছড়ি হত্যাকাণ্ড (১লা মে), (২) রামবাবুছেবা (মাটিরাঙ্গা) হত্যাকাণ্ড (১৮ মে,, (৩) চংড়াছড়ি হত্যাকাণ্ড (১৯শে মে)। আর শত শত জুম্ম গ্রাম, বৌদ্ধ বিহার ও হিন্দু মন্দিরে অগ্নিসংযোগ করা হয়। ফলে ১৯৮৬ সালের শেষ নাগাদ জুম্ম শরণার্থীদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৫০ হাজার।

জুম্ম শরণার্থীরা দ্বিতীয় পর্যায়ের আশ্রয় গ্রহণ শুরু করে ১৯৮৯ সালে মে-জুন মাসে। ইতিমধ্যে আরো দুটো গণ-হত্যা—বাঘাইছড়ি গণহত্যা (৮ই আগস্ট '৮৮) এবং লংগদু গণহত্যা (৪ঠা মে, '৯১) সংঘটিত হলে জুম্ম জনগণ আরো চরম নিরাপত্তাহীনতায় নিপতিত হয়। তদুপরি বাংলাদেশ সরকার ও জনসংহতি সমিতির সমঝোতার বৈঠক ভেঙ্গে গেলে বাংলাদেশ সরকার তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ নির্বাচনের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। একদিকে সরকারের নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি অন্যদিকে জনসংহতি সমিতির প্রতিরোধাত্মক ব্যবস্থার ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটে। ফলে পার্বত্য জেলা পরিষদ নির্বাচন বয়কট করে আরো ২০ হাজার জুম্ম শরণার্থী ভারতে প্রবেশ করে।

তৃতীয় পর্যায়ের শরণার্থী গমন শুরু হয় ১৯৯১ সালের এপ্রিল মাসে। ১০ই এপ্রিলে লোগাং গুচ্ছগ্রামে বিডিআর ও ভিডিপি বাহিনীর সহযোগে অনুপ্রবেশকারীরা আক্রমণ চালিয়ে শতাধিক জুম্ম নরনারীকে হত্যা করে। এই লোগাং গণহত্যার ফলে প্রায় তিন হাজার জুম্ম নর-নারী তৃতীয় পর্যায়ে ত্রিপুরায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়।

শরণার্থী সংখ্যা বিভ্রাট

ভারত আশ্রিত জুম্ম শরণার্থীদের নিয়ে বাংলাদেশ সরকার ও ভারতের মধ্যে প্রথম থেকে মতানৈক্য পরিদৃষ্ট হয়। প্রথম পর্যায়ে ভারত জুম্ম শরণার্থীদের সংখ্যা ৫০ হাজার দাবী করলেও বাংলাদেশ সরকার মাত্র ২৯ হাজার শরণার্থীকে স্বীকার করেছে। এভাবে ১৯৮৯ সালে শরণার্থী সংখ্যা ৭০ হাজারে উন্নীত হলেও বাংলাদেশ সরকার মাত্র ৪০ হাজারের কথা স্বীকার করে। তাছাড়া বাংলাদেশ সরকারের মতে ইতিমধ্যে প্রায় ২০ হাজার জুম্ম শরণার্থী স্বদেশে ফিরে এসেছে। সেই হিসেবে ভারতে অবস্থানরত শরণার্থীদের সংখ্যা দাঁড়ায় ২০ হাজার। অথচ ভারতে বর্ত, মানেও ৫৪,০০০ জুম্ম শরণার্থী অবস্থান করছে। শরণার্থীদের এই সংখ্যাগত বিভ্রাটের কোন সুস্পষ্ট সমাধান হয়নি। কিন্তু সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার সকল জুম্ম শরণার্থীদেরকে ফেরত নিতে রাজী হয়েছে।

আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া

জুম্ম শরণার্থীরা ত্রিপুরায় আশ্রয় গ্রহণের সাথে সাথে সারা ভারত ও পশ্চিমা বিশ্বে এক দারুণ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী ও অনুপ্রবেশকারীদের দ্বারা সংঘটিত হত্যাকাণ্ড, ধর্ষণ, লুন্ঠন ও অগ্নিসংযোগের মর্মান্তিক কাহিনী ভারত সহ সারা বিশ্বে বিপুল প্রচারণা লাভ করে। ভারত ও বিশ্বের বিভিন্ন মানবতাবাদী সংস্থা—এমনেষ্টি ইনন্টারন্যাশনাল, সার্ভাইভাল ইন্টারন্যাশনাল, ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্ক গ্রুপ ফর ইণ্ডিজেনাস এ্যাফেয়ার্স, ইউ এন ইকোনোমিক এণ্ড সোসিয়েল কাউন্সিল, সাপোর্ট গ্রুপ ফর ইণ্ডিজেনাস পিপলস, এন্টি স্লেভারী সোসাইটি, ইউনাইটেড স্টেটস কমিটি ফর রিফিউজীস, পেসিফিক এশিয়া কাউন্সিল অব ইণ্ডিজেনাস পিপলস, অক্সফাম, পার্লামেন্টারী হিউম্যান রাইটস গ্রুপ (ব্রিটেন), ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট, আর আই ও পি, কানাডা এশিয়া ওয়ার্কিং গ্রুফ, ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনশীপ অব রিকনসিলিয়েশন, আই এল ও হিভোস, ইউ এন পিও ইত্যাদি ও ভারতীয় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল মানবিক সংস্থা জুম্ম শরণার্থীদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসে। এই সব সংস্থাগুলি বাংলাদেশকে মানবাধিকার লংঘনের জন্য দোষারোপ করে। অসহায় জুম্মদের রক্ষার জন্য গঠিত হয় চিটাগাং হিল ট্রাক্টস কেমপেইন, চিটাগাং হিল ট্রাক্টস কমিশন, হিউম্যানিটি প্রোটেকশন ফোরাম (আগরতলা) ইত্যাদি মানবিক সংস্থা।

বস্তুত জুম্ম শরণার্থীদের ভারতে আশ্রয় গ্রহণের ফলে বাংলাদেশ সরকার আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে মানবাধিকার লংঘনকারী হিসেবে চিহ্নিত হয় ফলে সাহায্যকারী সংস্থা ও দাতা দেশগুলি বাংলাদেশ সরকারের উপর পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার সংরক্ষণের জন্য চাপ সৃষ্টি করে।

১৯৯০ সালের শেষ লগ্নে বিশ্বের আটটি দেশের বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত "পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন" জুম্ম জনগণের উপর সংঘটিত মানবাধিকার লংঘনের ঘটনাবলী তদন্ত করতে ভারতের জুম্ম শরণার্থী শিবির ও পার্বত্য চট্টগ্রাম সফর করেন। এই কমিশনের রিপোর্টে জুম্ম জনগণের উপর মানবাধিকার লংঘনের সকল বিষয় প্রমাণিত হয়। এভাবে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির মানবিক সমর্থনের ফলে জুম্ম শরণার্থী বিষয়টি আজ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির মানবিক সমর্থনের ফলে জুম্ম শরণার্থী বিষয়টি আজ আন্তর্জাতিক ইস্যুতে পরিণত হয়।

প্রত্যাবর্তনের উদ্যোগ

ত্রিপুরায় আশ্রিত জুম্ম শরণার্থীদের স্বদেশে ফিরিয়ে আনতে বাংলাদেশ প্রথম থেকে উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ও ভারতের প্রথম বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় ৫ই ডিসেম্বর, ১৯৮৬ সালে। সেনাবাহিনীর বিভাগীয় কমাণ্ডার পর্যায়ের এ বৈঠকে বাংলাদেশ প্রতিনিধিরা ২৪ হাজার জুম্ম শরণার্থী দেশে ফেরত আনতে রাজী হয়। এরপর ২৪ ও ২৯ ডিসেম্বর উভয় দেশের জেলা পর্যায়ে প্রতিনিধিরা জুম্ম শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে আলোচনা করেন। এ আলোচনায় বাংলাদেশ প্রতিনিধিরা পরিবার প্রতি ৫০০ টাকা ও ছয় মাসের রেশন দিতে রাজী হন। তাছাড়া ছয় জন জুম্ম প্রতিনিধিকে খাগড়াছড়ি জেলা সফর ও ৩টি সীমান্ত পয়েন্ট দিয়ে প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এসব সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ৬ই জানুয়ারী, '৮৭ দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার এ ডি এম-এর নেতৃত্বে ৬ জন শরণার্থী প্রতিনিধি খাগড়াছড়ি জেলার এ ডি সি'র সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হন। এ বৈঠকে বাংলাদেশ প্রতিনিধি পূর্ব প্রতিশ্রুতি পুনরাবৃত্তি করেন। পরবর্তীতে ভারতীয় বৈদেশিক বিষয়ক মন্ত্রী এন ডি তেওয়ারী ও বাংলাদেশ বিদেশ মন্ত্রী হুমায়ুন রশিদ ঢাকায় এক বৈঠকে ১৫ই জানুয়ারী, '৮৭ হতে জুম্ম শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ৬—১০ জানুয়ারী এন ডি তেওয়ারের ঢাকা সফরকালে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বাংলাদেশ ও ভারতের জুম্ম শরণার্থী প্রত্যাবর্তনের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও বিশ্বের মানবিক সংস্থাগুলি প্রতিবাদ ও প্রত্যাবর্তন বন্ধ করার আহবান জানায়। জুম্ম শরণার্থীরাও স্বদেশে প্রত্যাবর্তনে অস্বীকার করেন। বলা বাহুল্য সেই সময়ে পার্বত্য

চট্টগ্রামের পরিস্থিতি ছিল অস্বাভাবিক এবং শরণার্থীদের জীবনের কোন নিরাপত্তা ছিল না। তাই জুম্ম শরণার্থী প্রত্যাবর্তনের এই প্রথম উদ্যোগ ব্যর্থ হয়ে যায়।

এরপর ৪—৫ এপ্রিলে ভারতীয় বি এস এফ প্রধান এম মিশ্র ও বাংলাদেশের বি ডি আর প্রধান মে. জে. শফি আহম্মদ চৌধুরী এবং ২৭শে এপ্রিলে উভয় দেশের পররাষ্ট্র সচিবদ্বয় মোঃ ফকরুদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী (বাংলাদেশ) ও কে. পি. এস. মেনন (ভারত) এবং ২৯—৩০ মে, '৮৭ দু'দেশের জেলা প্রশাসকদ্বয় বৈঠকে মিলিত হন। কিন্তু এসব বৈঠকে প্রত্যাবর্তনের বিষয়ে কোন অগ্রগতি হয়নি। এ সময়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী পি ভি নরসীমা রাও-এর সাথে বাংলাদেশ রাষ্ট্রপতি এরশাদের। নরসীমা রাও সেই সময় প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর বিশেষ দূত হিসেবে ঢাকা সফর করেন ও শরণার্থী বিষয়ে এরশাদের সঙ্গে আলোচনা করেন।

জুম্ম শরণার্থী প্রত্যাবর্তনের ১ম উদ্যোগটির ব্যর্থতা ও পরবর্তী দ্বিপাক্ষিক বৈঠকসমূহের কোন অগ্রগতি না হলে বাংলাদেশ সরকার জুম্ম শরণার্থী নেতৃবৃন্দের সাথে বৈঠকে বসতে রাজী হন এ পর্যায়ের ত্রিপাক্ষিক (বাংলাদেশ, ভারত ও শরণার্থী নেতৃবৃন্দ) পরবর্তী ৬ বৎসরে ৫ বার অনুষ্ঠিত হয়। এইসব বৈঠকে জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা থেকে সচিব পর্যায়ের প্রতিনিধিরা নেতৃত্ব দেন। জুম্ম শরণার্থীদেরকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনে রাজী করানো ছিল এসব বৈঠকসমূহের মূল উদ্দেশ্য। বিশেষত শরণার্থীদের কোন দাবীপূরণ ব্যতিরেকে শুধুমাত্র মৌখিক আশ্বাসের মাধ্যমে শরণার্থীদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনে রাজী করানোর চেষ্টা চালানো হয়। শরণার্থীদের কোন দাবীনামা পর্যন্ত এসব বৈঠকে গ্রহণ করা হয়নি। তাই শরণার্থী নেতৃবৃন্দ প্রতিবারই স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে অস্বীকার করেন।

স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের পতনের পর বর্তমান বি এন পি সরকার শরণার্থীদের ফিরিয়ে আনতে নূতন উদ্যোগ গ্রহণ করে। বিশেষত লোগাং হত্যাকাণ্ডের (১০ এপ্রিল '৯২) পর দারুণ আন্তর্জাতিক চাপের মুখোমুখি হলে বাংলাদেশ সরকার এ উদ্যোগ নিতে বাধ্য হয়। এ উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকার প্রথমে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে জনসংহতি সমিতির সাথে সংলাপ শুরু করে। এ সংলাপ শুরু করার পূর্বে জনসংহতি সমিতি একতরফাভাবে তিন মাসের যুদ্ধবিরতি ঘোষণা (১০ আগস্ট '৯২) করলে পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে আসে। এরপর উভয়পক্ষের সংলাপের সাথে সাথে যুদ্ধবিরতি অব্যাহত থাকায় জুম্ম শরণার্থীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এ অবস্থায় যোগাযোগ মন্ত্রী ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক কমিটির আহ্বায়ক কর্ণেল অলি আহম্মদ জুম্ম শরণার্থীদের মতামত ব্যতিরেকে ভারতের বৈদেশিক প্রতিমন্ত্রীর সাথে ৮ই জুন' ৯৩ হতে শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তনের এক চুক্তি স্বাক্ষর করেন (৮ই মে '৯৩)। জুম্ম শরণার্থী নেতৃবৃন্দ স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের শর্ত হিসেবে যোগাযোগ মন্ত্রীর নিকট ১৩ দফা দাবীনামা পেশ করেন। অবশেষে এই ১৩ দফা দাবীনামা পূরণ ব্যতিরেকে জুম্ম শরণার্থীরা স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে অস্বীকার করলে এই সরকারী দ্বিতীয় উদ্যোগটি ব্যর্থ হয়ে যায়।

জুম্ম শরণার্থীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের দ্বিতীয় উদ্যোগটি ব্যর্থ হলে বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক কমিটির চারজন সংসদ সদস্যকে পর পর তিনবার ত্রিপুরায় প্রেরণ করেন এবং শরণার্থীদের অর্থনৈতিক দাবীগুলি পূরণে সম্মত হয়। এভাবে এটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শরণার্থীরা স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে রাজী হয়।

জুম্ম শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তন বিষয়ক সর্বশেষ ত্রিপাক্ষিক বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় ১৬ই জানুয়ারী '৯৪, রামগড়ে। এ বৈঠকে চট্টগ্রাম বিষয়ক কমিটির সদস্য রাশেদ খান মেনন বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন এবং ১০ জন শরণার্থী প্রতিনিধির নেতৃত্ব দেন জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতি সভাপতি উপেন্দ্রলাল চাকমা। ভারতীয় কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এ বৈঠকে বাংলাদেশ প্রতিনিধিরা প্রত্যাবর্তিত শরণার্থীদের জীবন ও সম্পত্তির নিশ্চয়তা, বেদখলকৃত ভূমি ফেরত প্রদান, চাকুরীজীবীদের পুনর্নিয়োগ ও সুষ্ঠু পুনর্বাসনের অঙ্গীকার করে।

অবশেষে ২৩শে জানুয়ারী জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির সভাপতি উপেন্দ্রলাল চাকমা ১৫ই ফেব্রুয়ারী

হতে শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তনের কথা ঘোষণা করেন। এই ঘোষণা অনুযায়ী গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী হতে জুম্ম শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তন শুরু হয়েছে।

প্রত্যাবর্তনের ভবিষ্যৎ

জুম্ম শরণার্থীদের এ স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে বাংলাদেশের বৈদেশিক ও আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে দূরপ্রসারী প্রভাব ফেলবে। প্রথমতঃ শরণার্থী সমস্যাটি বিগত বছরগুলোতে ভারতের সাথে বাংলাদেশের অন্যতম অমীমাংসিত দ্বিপাক্ষিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আসছে। শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তনে ভারতের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের একটি বাধা দূর হবে নিশ্চয়।

দ্বিতীয়তঃ পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের উপর আন্তর্জাতিক চাপ হ্রাস পাবে ও বৈদেশিক সাহায্য লাভ সহজতর হবে।

তৃতীয়তঃ এ শরণার্থীদের পূর্ণ প্রত্যাবর্তন ও সুষ্ঠু পুনর্বাসন বিরাজমান পার্বত্য সমস্যার সমাধান নিঃসন্দেহে ত্বরান্বিত করতে পারে।

তবে লক্ষণীয় যে, এককভাবে শরণার্থীদের পূর্ণ প্রত্যাবর্তন ও সুষ্ঠু পুনর্বাসনের উপর এসব শুভাশুভ নির্ভর করছে। আর শরণার্থীদের পূর্ণ প্রত্যাবর্তন নির্ভর করবে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে জনসংহতি সমিতি ও সরকারের আলোচনার অগ্রগতি, পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি, প্রত্যাবর্তিত শরণার্থীদের ভূমি ফেরত দান ও তাদের সুষ্ঠু পুনর্বাসনের উপর। সর্বোপরি বলা যায়, একমাত্র বাংলাদেশ সরকারের সদিচ্ছা ও আন্তরিকতার উপর জুম্ম শরণার্থীদের পূর্ণ প্রত্যাবর্তন নির্ভর করছে। বলা বাহুল্য যে, অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে অনেকে কিন্তু এ ব্যাপারে সন্দিহান। যেহেতু ১৯৭৮ ও ১৯৮১ সালেও দু'বার জুম্ম শরণার্থীরা ত্রিপুরা থেকে প্রত্যাবর্তন করে। কিন্তু তৎকালীন বাংলাদেশ সরকার সেই শরণার্থীদের দেয়া প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার পালনে ব্যর্থ হয়। অনুরূপভাবে ১৯৮৬তে মিজোরাম থেকে প্রত্যাগত শরণার্থীরা প্রতিশ্রুত কোন অর্থ ও পুনর্বাসন পায়নি। ফলে পরবর্তীতে আরও জুম্ম নরনারীকে বিদেশের মাটিতে আশ্রয় নিতে হয়েছে। তাই এবারে সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ রয়েছে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত বেগম খালেদা জিয়ার সরকারের প্রতি। একমাত্র ভবিষ্যতই বলে দেবে বর্তমান সরকার জুম্ম জনগণের সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে কতটুকু আন্তরিক।

Text of a Press Relese Issued by Sri Upendra Lal Chakma, President, CHT Jumma Refugee Welfare Association On the Declaration of Refugee Repatriation Has Been Given Here.

PRESS RELEASE Date—23.1.94

Declaration of Chittagong Hill Tracts (Ght) Jumma Refugees Welfare Association on Repatriation of Jumma Refugees from Tripura (S). India

About 70.000 jumma refugees from the CHT were compelled to take shelter in Tripura, India since 1986 and onwards as a result from killing; arrest, torture, rape eviction, land grabbing, etc by the Bangladesh army and Bengali muslim settlers. By now about 54,000 of them are living in the six relief camps in Tripura (s). There were several sittings between the Bangladesh government and India and also with Bangladesh government and jumma refugees leaders to facilitate the repatriation of the refugees The repatriation could not be materialised due to abnormal Political situation of the CHT and non-fulfilment of the demands on of the refugees for safe and honourable repatriation.

The last sitting for repatriation of the refugees was held on 16 january. 1994 at Ramgarh, a border town of Bangladesh between the Bangladesh team and jumma refugees leaders. The Bangladesh team was represented by Messrs. Rashed Khan Menon, MP. Kalpa Ranjan Chakma, MP. Shahjahan Chowdhury, MP. Mostaque Ahmed Chowdhury, MP, and Md. Shahjahan Chowdhury, MP, Messrs. Adbul Mannan, joint Sect. Home Affairs, Kazi Nashirul Islam, Director, Special Affairs, Shiful Amin Khan, Director, Foreign Affairs and number of officials from District administration were also present in the sitting. The jumma refugees team was represented by Messrs. Upendra Lal Chakma, Ranjit Narayan Tripura, Akshay Muni Chakma, Hemanta Prasad Chakma, Prabhakar Chakma, Hiranmay Chakma, Jadara Mog, Ajit Baran Chakma, Mong Cha Prue Karbari and Rabindra Nath Chakma, Messrs. Chandra Shekhar Chakraborty, DM South Tripura, Sanjib Kumar Rakesh, SDO, Amarpur and Sukbram Dev Barma, SDO, Sabroom from Government of India in the sitting.

The leaders of the jumma refugees Welfare Association placed their request before Bangladesh team for special consideration of their demands already submitted to Bangladesh Government in consideration of their inhuman suffering out of the political crisis in CHT.

They expressed their deep concern for the loss of lives in the recent ethnocide of Naniarchar in Rangamati District on November 17, 1993 perpetrated by security forces in league with muslim settlers and demanded examplary punishment of the culprits with guarantee for security of life

and property of the Jumma people in CHT. Bangladesh team expressed its earnest desire for repatriation of the refugees and were pleased to give assurance for guarantee of security for life and property of the jumma pepople. The Team also gave assurance for proper rehabilitation and special consideration of the demands submitted to the Government. Despite the tragic loss of in the recent Naniarchar messacres and prevailing unconducive condition in CHT, the jumma refugees Welfare Association in full confidence to the assurance given by Bangladesh Government and in the greater interest of the country accepted the following decisions on the repariation of the jumma refugees.

1. The CHT Jumma Refugees Welfare Association, as a mark of good will towards the peaceful political solution of CHT crisis and in full confidence with the assurance given by Bangladesh team in the sitting held at Ramgarh on January 16, 1994, for special consideration of the demands submitted to the Bangaladesh Government is pleased to accede with the request of the team for repatriation of the jumma refugees and hereby declare to start the repatriation move of about 400 families in the 1st batch as from February—15, 1994.

2. The guarantee for security of life and property; restoration of land and homestead proper rehabilitation of the returnee jumma refugees as assured by the Government of Bangladesh be ensured.

3. The Association would monitor the events of repatriation of the jumma refugees discuss occassionally with the Govt. Committee on CHT chaired by Col. (Rtd) Oli Ahmed, Communication Minister and would like to send Team of its representatives to visit CHT to observe the events of rehabilitation of the returnee jumma refugees.

4. The Association again reaffirm that the CHT jumma refugees problem is an offshoot crux of CHT political crisis. The process of continual move of repatriation would continue with the extent of progress of the on going dialogue between Jana Samhati Samiti (JSS) and Bangladesh Government for political solution of CHT crisis which would create conducive condition for safe and honourable repatriation.

শ্রী উপেন্দ্র লাল চাকমা, সভাপতি পার্বত্য চট্টগ্রাম জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতি কর্তৃক শরণার্থী প্রত্যাবাসন সম্পর্কিত ঘোষণার উপর দেয়া প্রেস বিজ্ঞপ্তির অনুবাদকৃত বয়ান নিম্নে দেয়া হলো ঃ

পার্বত্য চট্টগ্রাম জুম্ম শরণাথী কল্যাণ সমিতির সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

২৩শে জানুয়ারী, ১৯৯৪

জুম্ম শরণার্থীদের ত্রিপুরা (দঃ) ভারত থেকে স্বদেশ প্রত্যাবাসনে পার্বত্য চট্টগ্রাম জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির ঘোষণা।

১৯৮৬ ও তৎপরবর্তীতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও বাঙ্গালী মুসলমান বসতিকারীদের হত্যা, গ্রেপ্তার, নির্যাতন, ধর্ষণ, উচ্ছেদকরণ, ভূমি বেদখল প্রভৃতির ফলে প্রায় ৭০,০০০ জুম্ম শরণার্থী ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। বর্তমানে তাদের মধ্যে প্রায় ৫৪,০০০ শরণার্থী ত্রিপুরার ৬টি রিলিফ ক্যাম্পে অবস্থান করছে। এই সব শরণার্থীদের প্রত্যাবাসনের জন্য পূর্বে বাংলাদেশ সরকার ও ভারত সরকার এবং বাংলাদেশ ও জুম্ম শরণার্থী নেতাদের মধ্যে অনেকবার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে অস্বাভাবিক পরিস্থিতি এবং শরণার্থীদের নিরাপত্তা ও সম্মানজনক প্রত্যাবাসনের দাবী পূরণ না হওয়ায় শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন বাস্তবায়িত হয়নি।

শরণার্থীদের প্রত্যাবাসনের ব্যাপারে সর্বশেষ বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় গত ১৬ই জানুয়ারী '৯৪, বাংলাদেশের সীমান্ত শহর রামগড়ে। এ বৈঠকে বাংলাদেশ দলে ছিলেন মেসার্স রাশেদ খান মেনন, এম পি, কল্প রঞ্জন চাকমা, এম পি, শাজাহান চৌধুরী, এম, পি, আব্দুল মান্নান, জয়েন্ট সেক্রেটারী (স্বরাষ্ট্র), কাজী নাসীরুল ইসলাম, ডিরেক্টর, বিশেষ কার্যাদি বিভাগ, সাইফুল আমিন খান, ডিরেক্টর বৈদেশিক এবং জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাগণও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। অপর পক্ষে, জুম্ম শরণার্থীদের দলে ছিলেন মেসার্স উপেন্দ্র লাল চাকমা, রণজিত নারায়ণ ত্রিপুরা, অক্ষয় মণি চাকমা, হেমন্ত প্রসাদ চাকমা, প্রভাকর চাকমা, হিরন্ময় চাকমা, জদরা মগ, অজিত বরণ চাকমা, মংচা প্রু-কার্ব্বারী এবং রবীন্দ্রনাথ চাকমা। ভারতীয় সরকারী পক্ষে ছিলেন—চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী, ডি, এম, দক্ষিণ ত্রিপুরা, সঞ্জীব কুমার রাকেশ, এস, ডি, ও, অমরপুর, সুখরাম দেববর্মা, এস, ডি, ও, সাব্রুম।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির নেতৃবৃন্দ পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার উদ্ভূত পরিস্থিতির দুর্ভোগের কারণে শরণার্থীদের পূর্ব পেশাকৃত দাবীনামা বিশেষভাবে বিবেচনার জন্য বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের প্রতি অনুরোধ জানান। শরণার্থী নেতৃবৃন্দ মুসলিম বসতিকারীদের যোগসাজসে নিরাপত্তা বাহিনী কর্তৃক ১৭ই নভেম্বর ১৯৯৩, রাঙ্গামাটি জেলার সাম্প্রতিক নানিয়ারচর জাতিগত হত্যায় গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জুম্ম জনগণের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তার জন্য অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী করেন। বাংলাদেশ প্রতিনিধিরা শরণার্থীদের প্রত্যাবাসনের ব্যাপারে গভীর আগ্রহ প্রকাশ এবং জুম্ম জনগণের জীবন সম্পত্তির নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করেন। তাঁরা শরণার্থীদের সুষ্ঠু পুনর্বাসনের ও পেশকৃত দাবীনামার বিশেষ বিবেচনার নিশ্চয়তাও প্রদান করেন। নানিয়ারচর হত্যাকাণ্ডের মর্মান্তিক জীবন হানি ও পার্বত্য চট্টগ্রামে বিরাজমান অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সত্ত্বেও বাংলাদেশ সরকারের প্রতিশ্রুতির প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখে এবং দেশের বৃহত্তম স্বার্থে শরণার্থী কল্যাণ সমিতি জুম্ম শরণার্থীদের স্বদেশ প্রত্যাবাসনে নিম্নোক্ত

সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করেছে :—

(১) পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার শান্তিপূর্ণ ও রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষ্যে এবং ১৬ই জানুয়ারী, ১৯৯৪ রামগড়ে অনুষ্ঠিত বৈঠকে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের দাবীনামার বিশেষ বিবেচনার প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখে পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতি জুম্ম শরণার্থীদের স্বদেশ প্রত্যাবাসনে সম্মত হয়েছে এবং আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪ হতে ১ম দফায় ৪০০ পরিবার প্রত্যাবর্তন করার ঘোষণা প্রদান করছে।

(২) বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রতিশ্রুত জুম্ম শরণার্থীদের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা, ভূমি ও বাস্তুভিটার সংরক্ষণ এবং সুষ্ঠু পুনর্বাসন নিশ্চিত করতে হবে।

(৩) সমিতি যোগাযোগ মন্ত্রি কর্ণেল (অবঃ) অলি আহম্মদের নেতৃত্বে গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক কমিটির সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করবে এবং জুম্ম শরণার্থীদের পুনর্বাসন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রতিনিধি দল পাঠাবে।

(৪) সমিতি আরো ঘোষণা করছে যে, জুম্ম শরণার্থী সমস্যাটি পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা থেকে উদ্ভূত অতএব, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানার্থে বাংলাদেশ ও জনসংহতি সমিতির চলিত সংলাপের অগ্রগতিতে নিরাপদ ও সম্মানজনক প্রত্যাবাসনের পরিবেশ সৃষ্টি হলে প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া চলতে থাকবে।

বাংলাদেশে বিশ্ব আদিবাসী বর্ষ '৯৩ পালিত হয়নি

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ১৯৯৩ সালকে 'বিশ্ব আদিবাসী বর্ষ' হিসাবে ঘোষণা করা হয়। সারা বিশ্বের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ৬০ কোটি আদিবাসী বা সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর স্বকীয় বৈশিষ্ট্যকে স্বীকার করে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জাতিগত নিপীড়ন, শোষণ, বঞ্চনা ও শাসন থেকে বিশ্বে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করাই জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের এই উদ্যোগ। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের এ ঘোষণাকে সামনে রেখে সারা বিশ্বের ৩০ হাজার প্রতিনিধির উপস্থিতিতে গত বছরের ১৫ই জুন ভিয়েনায় সমাপ্ত হয়ে যায় বিশ্ব আদিবাসী বর্ষের উদ্দেশ্যে নিবেদিত এক আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সম্মেলন। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মুস্তাফিজুর রহমানসহ বাংলাদেশের অন্যান্য মানবাধিকার কর্মীও এ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

জাতিসংঘের এ ঘোষণায় সাড়া দিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রপ্রধানগণ এবং বিভিন্ন সংগঠন বিশ্বের সকল নিপীড়িত সংখ্যালঘু আদিবাসী জনগণের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে 'আদিবাসী বর্ষ' ৯৩-কে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে। বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র ও সংগঠনের এ উদ্যোগের ফলে বিশ্বের সকল সম্প্রদায়ের আদিবাসী জনগণের মনে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামসহ অন্যান্য অঞ্চলের ৪৫টি আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রায় ৩ মিলিয়ন বা ৩০ লক্ষ আদিবাসীও বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে এ বর্ষকে উদ্‌যাপনের উদ্যোগ নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে গত বছরের ডিসেম্বরে বাংলাদেশ সরকারের এক ঘোষণায় বলা হয় যে এ দেশে কোন আদিবাসী নেই। এ দেশে যে সমস্ত উপজাতি রয়েছে তারা দূর থেকে চলে আসা যাযাবর। সুতরাং এ দেশে 'আদিবাসী বর্ষ' '৯৩ উদ্‌যাপনের কোন প্রয়োজন নেই। বাংলাদেশ সরকারের এ ঘোষণা অতি দুঃখজনক। বাংলাদেশের এ ঘোষণাকে আদিবাসী জনগণ বিশ্বাসঘাতকপূর্ণ ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে মনে করেন। এ দেশের আদিবাসী জনগণ এ ঘোষণায় হতাশাগ্রস্ত, দুঃখিত ও আতংকিত হয়ে পড়েছেন এবং এ ঘোষণার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদও জানিয়েছেন।

গত বছরের ৩০শে ডিসেম্বর বাংলাদেশের খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা শহরেও জাতিসংঘের ঘোষিত এ বর্ষকে পালনের উদ্যোগ নেয়া হয়। কিন্তু স্থানীয় প্রশাসনের পরোক্ষ উস্কানীতে সরকারী মদতপুষ্ট বাঙালী সমন্বয় পরিষদ-এর বিরোধিতা করেছে। এ বর্ষ পালনের কর্মসূচীকে বানচাল

করার উদ্দেশ্যে আদিবাসী বিদ্বেষী এ বাঙালী সংগঠন ১৫ই ডিসেম্বর '৯৩ খাগড়াছড়ি জেলা সদরের শাপলা চত্বরে আয়োজিত এক সমাবেশে স্পষ্টভাবে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে যে, "আদিবাসী বর্ষ পালন কর্মসূচী সর্বাত্মক প্রতিহত করা হবে।" বাংলাদেশ সরকারের উপরোক্ত ঘোষণা এবং বাঙালী সমন্বয় পরিষদের উক্ত হুঁশিয়ারী উচ্চারণে এটাই স্পষ্ট যে, যদি খাগড়াছড়িতে এ বর্ষ পালন করা হতো, তা'হলে সরকারী মদতপুষ্ট এ বাঙালী সংগঠন অবশ্যই সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ বাধাতো এবং ১৭ই নভেম্বর '৯৩ ইং এর নানিয়চরের মত জুম্মদেরকে নির্বিচারে হত্যা করা হতো। তাই অপ্রত্যাশিত অপ্রীতিকর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে এড়িয়ে চলার জন্য পার্বত্যাঞ্চলের আদিবাসী জুম্ম জনগণকে ঢাকায় এ বর্ষকে উদ্‌যাপন করতে হয়েছিল।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী মুস্তাফিজুর রহমানসহ বাংলাদেশের অন্যান্য মানবাধিকার কর্মীদের গত বছরের ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত মানবাধিকার সম্মেলনে অংশগ্রহণ বিশ্বের সকল সংখ্যালঘু আদিবাসী জনগণের প্রতি বাংলাদেশ সরকারের দায়িত্ব বেড়ে যাবারই কথা। কিন্তু বাংলাদেশ সরকারের উপরোক্ত ঘোষণা এবং সরকারী মদতে বাঙালী সমন্বয় কমিটি কর্তৃক এ বর্ষ পালনে বাধার সৃষ্টি করা, বাংলাদেশের আদিবাসী সত্তাকে বিলুপ্ত করারই এক সুরভিসন্ধিমূলক পদক্ষেপ ছাড়া কিছুই নয় বলে বিশেষ মহলে ধারণা।

নানিয়াচর গণহত্যায় নিহত জুম্মদের উদ্দেশ্যে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও সমাবেশ

গত ৮ই জানুয়ারী নানিয়াচর থানা সদর এলাকায় পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ও পাহাড়ী গণপরিষদ ১৭ই নভেম্বর '৯৩ ইং এ অনুপ্রবেশকারীদের দ্বারা সংঘটিত গণহত্যায় নিহত জুম্মদের উদ্দেশ্যে এক অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও শোক সমাবেশের আয়োজন করে। সমাবেশে বাংলাদেশের বিরোধী রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ ও বাসদ এর নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিক (সেলিম সামাদসহ), মানবাধিকার কর্মী রোজালিন কোস্টা এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন ও বক্তব্য পেশ করেন। তাঁরা বক্তব্যে নানিয়াচর গণহত্যার তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করেন এবং উক্ত ঘটনা সংঘটনকারী অনুপ্রবেশকারী মুসলমান-বাঙালীদের এবং ঘটনার পরোক্ষ মদতদানকারী স্থানীয় ও সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনের কর্মকর্তাদেরকে বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতির কলংক হিসেবে আখ্যায়িত করেন এবং ঘটনার সাথে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের জোর দাবী জানান। প্রায় ১২/১৪ শত লোকের উক্ত সমাবেশে জুম্ম ছাত্র-ছাত্রীর উপস্থিতিই বেশী ছিল। স্থানীয় সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বাঁধা প্রদান ও অনুপ্রবেশকারী মুসলমান বাঙালীদের হুমকি প্রদর্শনের কারনে সাধারণ জুম্ম জনগণ উক্ত সমাবেশে অংশগ্রহণ করতে সাহস পায়নি বলে জানা যায়।

সংবাদ

হলিউড অভিনেতার সাংবাদিক সম্মেলন

অতি সম্প্রতি চিত্র জগতের স্বর্গভূমি হলিউডের অভিনেতা রিচার্ড গেরে (Richard Gere) ও জুম্ম শরণার্থীদের বিষয়ে লণ্ডনে এক সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন।

গত জানুয়ারী মাসের ১ম সপ্তাহে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত সেই সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, বাংলাদেশ পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মদেরকে (চাকমাদের) নিষ্ঠুর ও ধারাবাহিকভাবে ধ্বংশ করে চলেছে। কিন্তু বিশ্বে এ বিষয়টি বরাবরই অপ্রকাশিত রয়েছে। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামে যা ঘটছে তা প্রচার করা এবং প্রতিবাদ করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। এছাড়া এ সম্মেলনে সাংবাদিকরা তার অভিনয় ও পারিবারিক সম্বন্ধীয় বিভিন্ন বিষয়ও জানতে চান। উল্লেখ্য রিচার্ড গেরে একজন বৌদ্ধ ও তিব্বতের নির্বাচিত বৌদ্ধ ধর্মীয় লামা নেতা দালাই লামার বন্ধু।

জুম্ম ছাত্র গ্রেপ্তার

গত ৯ই জানুয়ারীতে মিথ্যা হত্যা মামলায় জড়িত করে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের দুইজন সদস্যকে গ্রেপ্তার ও অপর দু'জনের বিরুদ্ধে হুলিয়া জারী করা হয় হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, ৮ই জানুয়ারীতে অজ্ঞাত পরিচয় আততায়ীরা জনৈক রিক্সাচালক জামাল উদ্দীনকে আহত অবস্থায় জুম্ম অধ্যুষিত মহাজন পাড়ায় রেখে যায়। পরে গ্রামবাসীরা জামালউদ্দীনকে আহত অবস্থায় দেখে থানায় খবর দেয় ও হাসপাতালে নিয়ে যায়। এরপর জামাল উদ্দীনের মৃত্যু হলে অপর দু'জন রিক্সাচালক পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের বিরুদ্ধে মিথ্যা হত্যা মামলা দায়ের করে। এই জামাল উদ্দীনের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বাঙ্গালী সমন্বয় পরিষদ ১০ই জানুয়ারীতে জুম্মদের উপর সাম্প্রদায়িক আক্রমণের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এতে খাগড়াছড়িস্থ জুম্মরা অনেকে ঘরবাড়ী ছেড়ে নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। পর্যবেক্ষক মহলের ধারণা মহাজন পাড়া থেকে জুম্মদের উচ্ছেদ করার লক্ষ্যে ষড়যন্ত্রমূলক এ হত্যার পরিকল্পনা করা হয়েছে এবং মিথ্যা হত্যা মামলায় জড়িত করে পাহাড়ী ছাত্রদের হয়রানি করা হচ্ছে।

পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের প্রতিবাদ সমাবেশ

গত ৮ই জানুয়ারী খাগড়াছড়িতে জামাল নামে এক রিক্সাচালক অজ্ঞাতনামা আততায়ীর হাতে নিহত হয়। এ হত্যার সাথে জড়িত করে স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কতিপয় নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়। পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ এ সমস্ত মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারসহ ঘটনার সাথে জড়িত প্রকৃত দোষী ব্যক্তিদের সনাক্ত করে উপযুক্ত বিচার দাবী জানিয়েছেন এবং মিথ্যা মামলার প্রতিবাদ স্বরূপ মিছিল ও সমাবেশের উদ্যোগ নেন। পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের এ পরিকল্পিত মিছিল ও সমাবেশ বানচাল করে দেয়ার লক্ষ্যে খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসন গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী শুক্রবার থেকে খাগড়াছড়ি পৌর এলাকায় ১৪৪ ধারা জারী করেছে। জেলা প্রশাসনের জারীকৃত উক্ত ধারার সকল নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ও পাহাড়ী গণপরিষদ গত ৫ই ফেব্রুয়ারী, শনিবার বিকেলে পেরাছড়া এলাকায় পানছড়ি সড়কে এক প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করে। এ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন পাহাড়ী গণপরিষদের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক শক্তিপদ ত্রিপুরা এবং অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি প্রসিত বিকাশ খীসা, যুগ্ম সম্পাদক দীপ্তি শংকর চাকমা, জেলা শাখার সভাপতি ক্যজরী মারমা ও সাধারণ সম্পাদক প্রদীপন খীসা। বক্তারা অবিলম্বে সংগঠনের ছাত্রদের নামে আনীত মামলা প্রত্যাহার না করা হ'লে পৌরসভায় বলবৎ ১৪৪ ধারা অমান্য করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

(দৈনিক পূর্বকোণ, ৮ই ফেব্রুয়ারী'৯৪)

অপর এক যৌথ বিবৃতিতে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি শক্তিমান চাকমা এবং সাংগঠনিক সম্পাদক সঞ্চয় চাকমা এ ১৪৪ ধারার বিরুদ্ধে গভীর ক্ষোভ ও তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। (বাংলার বাণী, ৮ই ফেব্রুয়ারী '৯৪)

৩ মারমা যুবতীর উপর গণধর্ষণ

গত ১৩ই জানুয়ারী খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার রামগড় থানাধীন বাকছড়ি ইউনিয়নের ৩নং কালিয়াপাড়া ওয়ার্ডের বসতিকারী মেম্বার মোহম্মদ ইব্রাহিম ভীতি প্রদর্শন ও জবরদস্তি করে নিম্নোক্ত ৩ মারমা যুবতীকে কালিয়াপাড়াস্থ অনুপ্রবেশকারী মুসলমান বাঙালী শিবিরে নিয়ে যায়। সেদিন সারারাত্র উক্ত শিবিরে গণধর্ষণের পর সকালে ঘটনার কথা প্রকাশ না করার জন্য ধর্ষিতা উক্ত ৩ যুবতীকে ৩০০/- টাকা করে মোট ৯০০/- টাকা বখশিশ প্রদান করে বিদায় দেয়া হয় বলে জানা যায়। ধর্ষিতা ৩ মারমা যুবতীরা হচ্ছেন—(১) মিস্ শেই ক্ষুনং মারমা (১৮), পিতা—পেইমে মারমা, গ্রাম—যোগ্যাপাড়া বটতলী, ২১৩নং জুরে মরম মৌজা, থানা-রামগড়, (২) মিস্ আমজ্যা মারমা (১৬), পিতা—অংসেই মারমা, ঠিকানা—ঐ—। (৪) মিস্ ভানি মারমা (১৮), পিতা—আবা মেই, ঠিকানা—ঐ—।

যুদ্ধ বিরতির মেয়াদ বর্ধিত

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যেকার যুদ্ধ বিরতির মেয়াদ আরও আড়াই মাস বৃদ্ধি পেয়েছে। জনসংহতি সমিতির প্রচারিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই যুদ্ধ বিরতি মেয়াদ বৃদ্ধির কথা জানানো হয়েছে।

গত ২৪শে জানুয়ারীতে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো

হয় যে, ৩০শে জানুয়ারীতে দেশের ১৪টি সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন, সংসদ অধিবেশন ও রমজানের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকার মার্চ মাসের শেষে ৭ম বৈঠক অনুষ্ঠানের প্রস্তাব দেয়। বিজ্ঞপ্তিতে আরো বলা হয় যে, ৭ম বৈঠক বিলম্বিতকরণে সরকার প্রদর্শিত কারণগুলি জনসংহতি সমিতি যুক্তিসংগত মনে করে না। তদুপরি আগামী ৭ম বৈঠকে সমিতির সংশোধিত ৫ দফা দাবীনামার উপর সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক কমিটির সুস্পষ্ট মতামত জ্ঞাপনের পূর্বশর্তে ১৫ই এপ্রিল পর্যন্ত যুদ্ধবিরতি মেয়াদ বৃদ্ধি ও ৫—১০ই এপ্রিলের মধ্যে ৭ম বৈঠক অনুষ্ঠানের প্রস্তাব করা হয়েছে।

নানিয়াচরে অনেক জুম্ম পরিবার পলাতক জীবন কাটাচ্ছে

স্থানীয় সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনের ছত্রছায়ায় অনুপ্রবেশকারী মুসলমান বাঙালীরা ১৭ই নভেম্বর '৯৩ইং নানিয়াচরে সংঘটিত করলো নিরীহ জুম্মদের উপর এক নারকীয় হত্যাকাণ্ড। এ হত্যাকাণ্ডে শতাধিক জুম্মকে হত্যা, ৫ শতাধিক জুম্মকে আহত ও জুম্মদের অনেক ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েও অনুপ্রবেশকারীদের জিঘাংসা প্রবৃত্তি থেমে যায়নি। বর্তমানে উক্ত থানাধীন জুম্ম অধ্যুষিত গ্রামের পার্শ্ববর্তী অনুপ্রবেশকারী মুসলমান বাঙালীরা নিরীহ ও অসহায় জুম্মদেরকে অনুরূপ হত্যাকাণ্ডের নিরন্তর হুমকি দিয়ে যাচ্ছে বলে জানা গেছে। তাই অনুপ্রবেশকারীদের পাশবিক আক্রমণের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য অনুপ্রবেশকারীদের পাড়ার সন্নিকট ৭৪ নং বড়াদম মৌজাসহ বটবিল ও গুণশাছড়ি পাড়ার প্রায় ৫০/৬০ পরিবার, ৭৮ নং বগাছড়ি মৌজাসহ মুইস আদাম ও নবীন তালুকদার পাড়ার ৪০/৫০ পরিবার, কেঙ্গাকবা ও পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন স্থানে পলাতক এবং উদ্বাস্তু জীবন কাটাচ্ছে বলে জানা গেছে। তাছাড়া মুসলমান বাঙালীদের অনুরূপ জুম্ম হত্যার হুমকির কারণে বুড়িঘাট, মংখোলা, শলিপাড়া, মার্বাছড়া, বেতমারাখোলা, কুকুরমারা ইত্যাদি এলাকায় অনেক জুম্ম পরিবারও ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ঘরবাড়ী ছেড়ে উদ্বাস্তু জীবন কাটাচ্ছে বলে জানা গেছে।

একদিকে সকলপ্রকার নিরাপত্তারসহ স্ব স্ব বাস্তুভিটায় পুনর্বাসনের আশ্বাস প্রদান করে ত্রিপুরাসহ উদ্বাস্তু শিবির হ'তে পার্বত্য চট্টগ্রামের উদ্বাস্তু জুম্মদেরকে স্বদেশে ফেরত আনার জন্য সরকারের এত ডাক হাক, অপরদিকে বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ করার জন্য অনুপ্রবেশকারীদের দ্বারা নানিয়াচরে নিরীহ জুম্মদের উপর হত্যাকাণ্ড সংঘটন এবং তৎপরবর্তী জুম্মদের উপর হত্যার বিভিন্ন হুমকি প্রদানে স্থানীয় সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনের পরোক্ষ মদদ উপলব্ধি করে জুম্ম জনগণ দারুণ হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন।

সম্পাদনা, প্রকাশনা ও প্রচারণা : তথ্য ও প্রচার বিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সংহতি সমিতি।